প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়, ১৪২৮ (জুন, ২০২১)

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্

সংস্কৃত বিভাগীয়া পত্রিকা

শতভিষা

(বিশেষ কালিদাস সংখ্যা)

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্
চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর,
পিন-৭২১৬৪৯

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্

সংস্কৃত বিভাগীয়া পত্রিকা

শতভিষা

(বিশেষ কালিদাস সংখ্যা)

প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়, ১৪২৮ (জুন, ২০২১)

সম্পাদিকা

ডঃ রঞ্জনা গাঙ্গুলী (মুখার্জি),
বিভাগীয়-প্রধানা,
সংস্কৃত বিভাগ,
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্

পত্রিকা সমিতি

ডঃ বিজয়কৃষ্ণ রয় (অধ্যক্ষ)
রঞ্জনা গাঙ্গুলী (মুখার্জি) (সহযোগী অধ্যাপিকা)
দেবব্রত বেরা (সহকারী অধ্যাপক)
সায়ন্বিতা পাঁজা (সহকারী অধ্যাপিকা)
মনোজ কুমার বর্মন (সহকারী অধ্যাপক)

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্
চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর,
পিন-৭২১৬৪৯

সম্পাদিকার কলমে.....

২০১৫ সালে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্মেন্ট কলেজ ফর উইমেন যে যাত্রা শুরু করেছিল, তার সঙ্গে পা মিলিয়েই পথ চলা শুরু হয়েছিল কলেজের সংস্কৃত বিভাগের। প্রথম কিছুদিন চলার পর বিভাগে যখন অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন থেকেই বিভাগের চিন্তাভাবনার মধ্যে বিচরণ করছিল বিভাগের একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করার কথা। কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠছিল না। বর্তমানে অতিমারীর সময়ে দীর্ঘদিন ছাত্রীদের সামনে থেকে না দেখতে পেয়ে আমরাও যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে ছাত্রী অধ্যাপক মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। বর্তমান স্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করাই একমাত্র উপায় বিবেচিত হয়েছে। পত্রিকার নাম দিলাম ***শতভিষা,*** যা একটি নক্ষত্রের নাম। আমরা চাই আমাদের এই পত্রিকা সকলের মনে নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান হোক।

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিষ্ক তাই প্রথম সংখ্যা আর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 'কালিদাস বিশেষ সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হল।

কালিদাস মহাকবি হিসাবে পরিচিত হলেও নাট্যকার হিসাবেও প্রথিতযশা। তার তিনটি নাটক যথাক্রমে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। এর মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সবিশেষ চর্চিত। মহাভারত এবং পদ্মপুরাণ এই নাটকের কাহিনীর উৎস হলেও কালিদাস নাটক রচনার সময় কাহিনীতে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। এই নাটকের উপর ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখরা বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এমনকি বিদেশীরাও এই নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হন। স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৯ সালে এই নাটকের ইংরেজি গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং কালিদাস কে ভারতীয় শেক্সপিয়ার বলে অভিহিত করেন। এই অনুবাদ কে আশ্রয় করেই ১৭৯১ সালে জর্জ ফরস্টার শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ করেন। জার্মান অনুবাদটি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে মহাকবি গ্যেটে বলেন **'যদি সূচনাকালের প্রকাশ এবং পরিমিত কালের ফল, যদি উত্তেজনা বিশ্বকে এক কথায় বলতে বলা হয় যদি স্বর্গ ও পৃথিবীর পূর্ণতা ও প্রশংসনীয় সমন্বয় এর উদাহরণ এককথায় দিতে বলা হয় তাহলে আমি শকুন্তলার কথা বলব এবং তাতেই সব বলা হয়ে যাবে।'**

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের আত্মা। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে উৎসর্গ করে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। অন্তর্ভুক্ত রচনা গুলি মূলতঃ মেয়েরাই করেছে। প্রশ্ন হতে পারে সংস্কৃত বিভাগের পত্রিকা কেন বাংলা প্রকাশ করা হলো। এক্ষেত্রে উত্তর হল বিভাগের উদ্দেশ্য সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সকলকে অবগত করা। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ফলে সকলেই অতি সহজে বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে যাঁর অকৃপণ সাহায্য ছাড়া আমরা এক পাও এগোতে পারতাম না। এরপর বলবো আমার অনুজপ্রতিম দুই সহকর্মীর কথা। যাদের উৎসাহে এবং পরিশ্রমে এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সবশেষে আমি আমার বিভাগের মেয়েদের সবিশেষ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাবো, যারা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সুন্দর প্রবন্ধগুলি

রচনা করেছে এবং সুন্দর অঙ্কন কলা দ্বারা পত্রিকাকে সুসজ্জিত করেছে। আদি কবি মহামুনি বাল্মীকিকে প্রণাম জানিয়ে আমার ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলকে ভালো রাখুন।

ধন্যবাদান্তে

রঞ্জনা গাঙ্গুলী (মুখার্জি),
বিভাগীয়-প্রধানা,
সংস্কৃত বিভাগ,
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্মেন্ট কলেজ ফর উইমেন।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কালিদাসের সৌন্দর্যাত্মক ব্যক্তিত্বের বিকাশ
- ডঃ দেবব্রত বেরা..... ৮-১৩

কালিদাসের কাব্যে মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক
পুষ্পের "এক অধ্যয়ন" - ঈশিতা চক্রবর্তী ১৪-১৯

মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষের
সমীক্ষা - নীলিমা মাইতি..... ২০-২৩

চিত্রকলা - মৌমিতা ঘোড়াই..... ২৪

কালিদাসের উপমা প্রয়োগে
সাবলীলতার বিশ্লেষণ - দীপিকা মাইতি..... ২৫-২৯

ভারতীয় আর্দশ নারী চরিত্রে
শকুন্তলার বিশ্লেষণ - মৌমিতা ঘোড়ই..... ৩০-৩৩

কালিদাসের জন্মস্থান বিষয়ে
পর্যালোচনা - স্বাতী মণ্ডল ৩৪-৩৮

চিত্রকলা - মৌমিতা মান্না..... ৩৯

“প্রকৃতির কবি কালিদাস” –
সমীক্ষাত্মক আলোচনা - সাহেবা খাতুন ৪০-৪৪

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কালিদাসের দৃষ্টিতে হিমালয় - সঞ্চিতা বর্মন..... ৪৫-৪৮

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে অশোক
পুষ্পের সমীক্ষা - রুনী মাইতি ৪৯-৫৫

কালিদাসের জীবন বৃত্তান্তের আলোচনা - নমিতা জানা...৫৬-৬০

কালিদাসের সৌন্দর্যাত্মক ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ডঃ দেবব্রত বেরা
(সহকারী অধ্যাপক)

ভারতের কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস। ঋষিকবি বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের পরে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্য ভারতবর্ষের হৃদয়কে গভীরভাবে আপ্লুত করেছেন। শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই কালিদাস কাব্যের গৌরব সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ আবদ্ধ নয়, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বহৃদয়ের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অবদান চিরস্মরণীয়।

ব্যক্তিত্ব (Personality) বলতে পরিবেশগত ও শারীরিক উপাদানের প্রভাবে বিকশিত চারিত্রিক উদাহরণ আচরণ, বোধ, আবেগকে বুঝায়। প্রসিদ্ধ সৌন্দর্যশাস্ত্রী ক্রোচে (Kroche) কাব্যকৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবিদের দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমতঃ 'কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্ব' (Peotic Personality) এবং দ্বিতীয়তঃ 'ব্যবহারিক ব্যক্তিত্ব' (Practical Personality)।

কালিদাসের **‘কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্ব’**। যদিও এই দুই ধরণের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও বিভাজন রেখা টানা যায় না, তবে রচনা করার সময় , কবি বা শিল্পীদের প্রতিদিন ব্যক্তিত্বের খুব বেশি সংশোধন হতে থাকে। যেমন ভাবে খাঁটি সোনা পাওয়ার জন্য কাঁচা ধাতুকে আগুনে গলাতে হয়, ঠিক তেমনি কবিদের ব্যবহারিক ব্যক্তিত্ব আবেগ , সংস্কার ও সংশোধনের দ্বারা ব্যক্তিত্বের রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রকৃতির কবি কালিদাস তার কাব্য ও নাটকে প্রকৃতিকে এমন আপন করে বর্ণনা করেছেন যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গাঢ় অন্তরঙ্গতার ভাব প্রকট হয়ে উঠে। এই জড় ও প্রকৃতিকে ভাবপ্রবণ করে বর্ণনা করায় কালিদাসের সৌন্দর্যাত্মক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃ কোন কবির রচনা মধ্যে ব্যবহারিক ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলে তাকে প্রমাদপূর্ণ বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শেক্সপিয়ার তাঁর অধিবাসীদের হিংসা তথা হত্যার চিত্র অঙ্কন দেখে মনে হতে পারে যে কবি তার চিন্তা শক্তির মাধ্যমে জীবনে হিংসার বা হত্যার মতো জঘন্য কাজ তুলে ধরেন। তবে কবি আসল ব্যক্তিত্ব

স্রষ্টার ভূমিকায় রূপান্তরিত হয় এবং তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করার সময় আমরা তাঁর কাব্যিক ব্যক্তিত্বের সাথে মিলিত হতে পারি। ঠিক যেমন কালিদাসের কাব্য বা নাটকে **কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্বের** ভিত্তি প্রস্তর দেখতে পাই।

কালিদাস হলেন **"কবিযশঃ প্রার্থী"।** রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুবংশের মধ্যে নক্ষত্রখচিত আকাশ , ফেনিল সমুদ্র , সবুজ বনস্থলী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সুপ্রকাশ করেছেন। কবি মানবমনের দুঃখের সহিত সমগ্র প্রকৃতিকে সমদুঃখপ্রবণ করে অঙ্কন করেছেন। কবি মেঘদূতে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ বার্তা বহনে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করে যেন জীবন্ত দূতকে দৌতকর্মে নিযুক্ত করেছেন। তখনি সার্থক ও মূল্যবান হয় যখন বিদ্বানদের প্রংশসা বিচ্ছুরিত হয়। তাই কবি বলেছেন যে - **"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা"** অর্থাৎ এই জরুরি অবস্থাতেই তাঁর নম্রতা ও তাঁর অন্তরের আত্মবিশ্বাসের এক ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। কালিদাস তাঁর সমৃদ্ধশালী ও গৌরবময় যুগের জন্ম দিয়েছিলেন। রাজন্য বর্গের সাথে ঘনিষ্ঠ

সর্ম্পক থাকার কারণে তিনি সামন্তীয় বিলাসিতা এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রেরণাগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তাদের যুগকে, **মহর্ষি অরবিন্দ** বলেছেন যে, পারস্পরিক বিরোধীদের দ্বারা চালিত হলে ও অন্যদিকে ধার্মিক মান্যতা অখণ্ড বিশ্বাস প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কালিদাসের লেখনীতে দুই প্রকার চিত্রের দর্শন পাওয়া যায়। প্রথমটি কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্বের একতরফা ভারতীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত পুরানো মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত এক দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে সৌন্দর্যের ব্যক্তিত্বের আকণ্ঠ রস আস্বাদ করা যায়। রঘুবংশী রাজাদের বিবরণ বর্ণনা করার সময়, তিনি অনেক ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালনের তৎপরতাও দেখিয়েছেন। যদিও লৌকিক বিষয়ের উপলব্ধিগুলি বর্ণিত হয়েছে তবুও তারা বনে অবস্থিত আশ্রমগুলির অবস্থার কথা ভুলেনি , কারণ বৃক্ষলতার প্রথম পুষ্পোদ্গমে শকুন্তলা এত আনন্দিত হত যে , সে তাকে উৎসব বলে মনে করত। এই জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণন পাওয়া যায়। কালিদাস রাজন্য বর্গের একমাত্র সমর্থক হননি। তিনি বিপরীতে দিলীপকে বসিষ্ঠাশ্রমে

প্রেরণ করেছিলেন এবং নন্দিনীকে দেখাশোনা করতে বাধ্য করেছিলেন। এর অর্থ হল কবি-ব্যক্তিত্ব লৌকিক বৈভবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও মহাজাগতিক বিষয়ে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। কেবল এমনটা নয় , অগ্নিবর্ণের অনিয়ন্ত্রিত কামুকতার দুষ্পরিণাম চিত্রিত করেছেন। তাকে সংযম তথা মর্যাদার কান্তাসম্মিত উপদেশ দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি দেখে কবি-ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য স্বরূপ বলা যেতে পারে। একদিকে তিনি সৌন্দর্যের সাধক ও প্রেমের গায়ক কবি, শিল্পসংস্কৃতির প্রেমী-, নৃত্যসংগীতের প্রেমিকা-, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবল অনুরোধে তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ না করার জন্য প্রার্থনা। একইভাবে তপোবনে তপস্যার কঠোরতা অন্যদিকেও গৌরব উজ্জ্বল পারিবারিক গৃহস্থাশ্রম বিষয়ে চিত্রিত করেছেন। তাদের নায়িকারা তপোবন থেকে ঘরে প্রবেশ করেছে। এমনকি কালিদাস বিক্রমতার বিষয়টি মাথায় রেখে সমাপন করছেন। ঋগ্বেদে পুরূরবা ও উর্বশী আখ্যানটি যেভাবে প্রাপ্ত হয়েছে , সেইরূপ উর্বশী পুরূরবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও পুনরায় ফিরে আসছে। কিন্তু কালিদাস কেবল ফিরিয়ে আনেন নি তিনি তাদের দুই জনের মধ্যে

পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের মাধ্যমে এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে সন্তান উৎপত্তির কারণে প্রেমিক ও প্রেমিকাকে গৃস্থাশ্রমের মহিমায় আবদ্ধ করেছেন। এখানে কালিদাসের ব্যক্তিত্বের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

কালিদাসের ব্যক্তিত্বের জটিল স্বরূপ ও দেখা যায় , এই বিষয়ে একটা নিষ্কর্ষতে আসা যায় যে তিনি অলঙ্কার প্রেমিক ছিলেন। তার সমস্ত নায়িকারা **"মন্ডনপ্রিয়া"** ছিলেন। যদিও তারা কেবল ফুল , সিঁদুর ও কেসর ইত্যাদি ধারণ করে থাকেন , তা কেবল সৌন্দর্য বর্ধক হিসাবে কাজ করে। সমস্ত নায়িকা সাজসজ্জার প্রতি আগ্রহ ছিলো না , এটা অনুমান করা যায়।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে বলা হয়েছে যে- **"গুণৈরুদ্যানলতা** বনলতাভিঃ" অর্থাৎ বাগানের সযত্নে লালিত লতা আজ বনের অযত্নের বর্ধিত লতার সৌন্দর্য্যের পরাভূত হয়েছে। সুন্দর উপমার দ্বারা কবি ব্যক্তিত্বের মহিমা মণ্ডিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে কালিদাসের কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সমস্ত কাব্য ও নাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে সমস্ত কবিদের মধ্যে কাব্যাত্মক ব্যক্তিত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয় সংস্কারের দ্বারা ও চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। এই দৃষ্টান্ত সমূহ অন্য কবিদের মধ্যে দেখা যায়।

কালিদাসের কাব্যে মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক পুষ্পের "এক অধ্যয়ন"

- ঈশিতা চক্রবর্তী
(সংস্কৃত অনার্স, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

প্রকৃতির রাজ্যে ফুল এক অপরূপ সৃষ্টি। কেবল বর্ণ -বৈচিত্র্যে নয়, বা গন্ধ মাধুর্যে নয় , ফুলের আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরন্তন। ভক্ত ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় , শ্রদ্ধা প্রীতিভরে মানুষ প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে ফুল অর্পণ করে। কবির রস-দৃষ্টিতে ফুলের এই মহিমাময় লাবণ্য ধরা পড়েছে।

কালিদাসের কাব্যে পদ্ম, অশোক, শিরীষ, বকুল, কাশ, পলাশ প্রভৃতি ফুলের সমাদর থাকলে ও হরিচন্দন , কল্পতরু, মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক - এই পাঁচটি হচ্ছে স্বর্গের নন্দনবনের দেবতরু। কালিদাসের রচনায় স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে তাঁর নানা কাব্যে ও নাটকে। তাই নন্দনের ফুলগুলি কবির কল্পনার স্রোত বেয়ে নেমে এসেছে তাঁর কাব্যের মধ্যে। পাঁচটি দেবতরুর মধ্যে তিনটি দেবতরুর ফুলের সন্ধান পাই মহাকবির রচনায়। হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষের ও উল্লেখ আছে তাঁর রচনায়। কালিদাসের কাব্যের বিভিন্ন সর্গে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে - "মেঘদূতম্" এর উত্তর মেঘ খন্ডে অভিসারিকাদের অভিসারের বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে বলেছেন-

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্।।
উত্তরমেঘ-১১।।

অভিসারিকারা যত গোপনেই অভিসারে যাক না কেন , সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বুঝতে পারে এই পথেই গত রজনীতে প্রিয় অভিসারে যাত্রা করেছিল সুন্দরী কামিনীরা - দ্রুত গমনের ঝাঁকুনিতে পথে পড়ে থাকা তাদের অলক থেকে খসে পড়া মন্দার ফুলের মালা, খসে পড়া পত্র লতার চন্দনরেণু , কান থেকে খসে পড়া সোনার পদ্ম , খোঁপা থেকে খসে পড়া মুক্তোমালা এবং বুক থেকে খসে পড়া ছেঁড়া হার ইত্যাদি থেকে অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে মন্দার পুষ্পের উল্লেখ দেখা যায় । 'কুমারসম্ভবম্' এর পঞ্চম সর্গে পার্বতী ব্রহ্মচারী অতিথিকে বলেছেন-

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রতিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী।।
(৫/৮০)

দরিদ্র মহেশ্বর যখন বৃষারূঢ় হয়ে গমন করেন তখন মদস্রাবী দিগ্ গজারূঢ় দেবরাজ তাঁর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করে বিকশিত কল্পতরু কুসুম পরাগে ঐ চরণযুগল রঞ্জিত হয় । এখানেও কল্পতরু কুসুম পারিজাত পুষ্পের উল্লেখ পাই। 'কুমারসম্ভবম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে বর্ণনা আছে আকাশ-গঙ্গা মন্দাকিনীর। সপ্তর্ষিরা শিবের তপোবনে এসেছেন মন্দাকিনীর অপূর্ব শোভা উপভোগ করতে এসে বলছেন যে-

আপ্লুতাস্তীরমন্দারকুসুমোৎকীরবীচিষু।
ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগমদগন্ধিষু।।(৬/৫)

অর্থাৎ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর তীরবর্তী মন্দারকুসুমগুলি উড়ে এসে তার ছোট ছোট ঢেউগুলির ওপর পড়ছে, ভাসছে ও খেলা করছে। দিঙ্নাগদের মদবারি গন্ধে সুগন্ধি হয়ে উঠেছে তার জলরাশি। মহাদেবের সামনে ঋষিরা এসে যেন সেই সুগন্ধি জলরাশিতে স্নান করলেন। মন্দার পুষ্পের গন্ধে আনন্দে সপ্তর্ষিরা আপ্লুত হয়েছেন । আবার 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের ষষ্ট সর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ছবি এঁকেছেন। স্বয়ংবর সভায়

ইন্দুমতীর সখী সুনন্দা এক এক করে রাজাদের পরিচয় দিচ্ছেন ইন্দুমতীকে। রাজা পরন্তপের পরিচয় দিয়ে সুনন্দা বলেছেন-

ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার।।

(৬/২৩।।)

অর্থাৎ নৃপতি অনবরত যাগযজ্ঞ করেন , সেখানে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র উপস্থিত থাকেন , ফলে শচীদেবীর পান্ডুর কপালে এসে পড়া অলকাবলীতে দীর্ঘদিন ধরে মন্দারফুল শোভা পায় না। রাজা পুরূরবা সৌরলোক থেকে আকাশ পথে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসছেন। পথে নারীর ক্রন্দন শুনে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে কেশি নামক দানব ঊর্বশীকে হরণ করে নিয়ে গেছে তাই সখীরা কাদঁছে। রাজা পুরূরবা ঊর্বশীকে উদ্ধার করলেন দানবের হাত থেকে। দানবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পরেও ঊর্বশীর যে বিকল অবস্থা, তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' এর প্রথম অঙ্কে-

মন্দারকুসুমদাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ।।

(প্রথম অঙ্ক-৭।।)

অর্থাৎ পয়োধরযুগলের মধ্যস্থিত মন্দারমালা কেমন মাঝে মাঝে কাঁপছে এর থেকেই অনুমান হয় , এর প্রাণ খুব জোরেই স্পন্দিত হচ্ছে। আবার ঊর্বশীর বিরহে পাগল হয়ে নৃপতি পুরূরবা তাঁর সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে বিরহ কাতর পুরূরবার বর্ণনা করেছেন কালিদাস। একটি অপরূপ মণি পেয়েছেন পুরূরবা। সেই মণিটি নিয়ে তিনি বিলাপ করছেন-

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ।
সৈব প্রিয়া সম্প্রতি দুর্লভা মেনৈবৈনমশ্রূপহতং করোমি।।

অর্থাৎ প্রিয়তমার মন্দারকুসুম দ্বারা সুরঞ্জিত সিঁথিতে এই মণি পরাতে পারলে সুখী হতাম, সে আজ কোথায়? আর তো তাকে

পাবো না। তবে শুধু শুধু একে আর কলঙ্কিত করি কেন ? এই বিলাপ করার পর পুরু বিদায় নিলেন। তার সাথে আমরা জানলাম যে মন্দার পুষ্পের গুরুত্ব প্রাচীন কালে ছিল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে রাজা দুষ্যন্ত স্বর্গ থেকে ম র্ত্যে আসছেন। স্বর্গে দেবরাজ তাঁকে কতো সমাদরে অভ্যর্থনা করেছেন , তাঁর সিংহাসনের আধখানিতে দুষ্যন্তকে বসিয়ে কী প্রীতিই না তাঁকে দেখিয়েছেন। এই সব বর্ণনা করে দুষ্যন্ত মাতলিকে বলেছেন-

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা।।
(সপ্তম অঙ্ক-২।।)

অর্থাৎ দেবরাজের বক্ষস্থল যে দুর্লভ হরিচন্দনে লিপ্ত ছিল সে চন্দন ঐ মালায় বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তার শোভা বেড়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেবতার সামনে তিনি আমাকে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসিয়ে মন্দারকুসুমের মালা নিজের হাতে আমার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন। নিকটেই তাঁর পুত্র জয়ন্ত দাড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে সেই মালাটির দিকে তাকিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে মন্দার পুষ্পের কতই না মাহাত্ম্য ছিল। উমার বিবাহের দিন ওষধিপ্রস্থনগর অভিনব সাজে সেজেছে। 'কুমারসম্ভবম্'এর সপ্তম সর্গে নগাধিরাজ হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থনগরের বর্ণনা করে কবি বলেছেন-

সন্তানকাকীর্ণমহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্।
ভাসোজ্জ্বলৎকাঞ্চনতোরণানাং স্থানান্তরং স্বর্গং ইবাবভাসে।। (৭/৩)

অর্থাৎ রাজপথ মন্দারপুষ্পের দ্বারা আস্তরণ ও চীনদেশীয় অতিসূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকামালা সজ্জিত করা হলো। মাঝে মাঝে নির্মিত হলো সূর্যতোরণ। তাদের দীপ্তিতে ওষধিপ্রস্থনগরের রাজপথ এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যে তা দেখে মনে হতে লাগলো সাক্ষাৎ স্বর্গধামই যেন ওষধিপ্রস্থনগরে পরিণত হয়েছে। যে মন্দার পুষ্পের

শোভা এতই নগরের নাম পরিবর্তনের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল।

রামের জন্মক্ষণে দেবতারা আকাশ থেকে সন্তানক কুসুমের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে সন্তানক পুষ্পের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস বলছেন যে–

সন্তানকময়ী বৃষ্টিভর্বনে চাস্য পেতুষী
সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ।।

দশমসর্গ।।৭৭-

অর্থাৎ পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তূর্যধ্বণির মধ্যে স্বর্গেই প্রথম দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। রাজার প্রাসাদে পারিজাতের পুষ্পবৃষ্টি হলো। এই বৃষ্টিই যেনো সমস্ত মাঙ্গলিক কর্মের প্রথম অনুষ্ঠান । তৎকালীন সমাজে সন্তানক পুষ্প মাঙ্গলিক কর্মে প্রযুক্ত হত তার উদাহরণ এই কাব্যে পেয়েছি।

'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যে অষ্টম সর্গে মহাদেব নিজ হাতে পার্বতীকে কেমন করে পারিজাত কুসুম দিয়ে সাজাতেন তার বর্ণনা করেছেন-

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্।
নন্দনে চিরমযুগ্মলোচনঃ সস্পৃহং সুরবধভিরীক্ষিতঃ।।

(অষ্টমসর্গ-২৭।।)

অর্থাৎ নন্দনবনে নীলকণ্ঠ যখন পারিজাত কুসুম দিয়ে পার্বতীর অলকদাম সাজিয়ে দিতেন তখন কত পুণ্যের ফলে এমন পতি লাভ করা যায় একথা ভাবতে ভাবতে সুরকামিনীরা সকাম হৃদয় ও নয়নে চেয়ে থাকতেন উমা-মহেশের দিকে। এখানে উমার সাথে পারিজাত কুসুমের সৌন্দর্যতা দেখতে পাওয়া যায়।

পুরূরবা বয়স্য বিদূষককে নিয়ে ঘুরছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ থেকে ঊর্বশীর লিপি এসে পড়লো তাঁর সামনে। 'বিক্রমোবর্শীয়ম্'-নাটকে সেই লিপির বর্ণনা করেছেন মহাকবি –

স্বামিন্ সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী

ভবন্তি সুখা নন্দনবনবাতা অপি শিখীব শরীরে।।

(দ্বিতীয় অঙ্ক -১০১)

অর্থাৎ তুমি যেমন ভেবেছো আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি, আমিও তেমনি ভেবেছি যে আমার মনের কথা তুমিও বুঝতে পারনি। তাই এখন পারিজাত কুসুমের শয্যা এবং নন্দনকাননের সুরভিমধুর বাতাস আমার নিকট জ্বলন্ত আগুনের মতো তাপদায়ক মনে হচ্ছিল । পারিজাত কুসুমের সুন্দর বর্ণন এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক এই পুষ্পগুলির বর্ণনা মহাকবি কালিদাসের লেখনীতে সজীব হয়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে যে এই পুষ্পের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, তা তার বিভিন্ন কাব্যে আমরা পাই। প্রকৃতির সাথে পুষ্পের মিলনে অপরূপ মাধুর্য্য লেখন শৈলীতে পাওয়া যায়। তাই কালিদাসের কাব্যে এই ফুলগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

----***----

মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষের সমীক্ষা

নীলিমা মাইতি
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত গীতিকাব্য "মেঘদূত" অনন্য-অনবদ্য কালজয়ী সৃষ্টি। কী করে একখণ্ড মেঘ কবির কল্পনায় হয়ে উঠছে বিরহীর বার্তাবাহক প্রাণবন্ত জীবন্ত দূত! মেঘের সাথে বিরহমথিত আবেগে কবির কথোপকথন প্রকৃতির সাথে কল্পনার মিশেলে এক অপূর্ব ঐকতান তৈরি করে। এর কোনো তুলনা নেই। যক্ষ মেঘকে দূত রূপে কল্পনা করে প্রিয়ার কাছে নিজের কুশল সংবাদ পাঠাতে চায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘদূতের রূপকার্থ বিশ্লেষণে এই মহৎ সৃষ্টিকে মানুষের চিরবিরহবোধের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখেছেন। কী করে একজনের বেদনাবোধক সর্বজনীন হয় তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল-

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সংদেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা।।

(পূর্বমেঘ-৭।।)

সর্বজনীন এই বিরহভাবের উপলব্ধি মহাকবি কালিদাসের বিরচিত 'মেঘদূত' কখনো পুরনো হয় না বরং জীবনে এর আবেদন চিরায়ত। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আকাশে

নূতন মেঘ! মেঘের কী অপূর্ব সাজ , আর বাইরে আওয়াজ। মেঘের এই গুরুগম্ভীর নিনাদে বিরহ চৈতন্যের আবেগ সঞ্চারিত করে অচেতন মেঘকে বিরহের তীব্রতায় সচেতন করে বার্তাবাহক দূত হিসেবে প্রিয়ার কাছে প্রেরণ করেছেন মহাকবি কালিদাস। এ এক অপূর্ব বিরহ-বেদনা গ্রথিত গীতিকাব্য। প্রিয়জন থেকে সুদূরে অবস্থানরত প্রিয়জনের একান্ত সান্নিধ্য বঞ্চিত জীবনের আবেগময় কাতর অনুভব মেঘকে তথা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে অনন্য অনবদ্য ভঙ্গীমায় মেঘদূতে এমনভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে যা প্রকৃতির সাথে জীবনের এক নিখুঁত সমীকরণ। কর্তব্যে অবহেলার জন্য এক প্রেমিক যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে এক বছরের জন্য পত্নী বিরহিত জীবন যাপন করতে রামগিরি আশ্রমে নির্বাসিত হয়। স্থানটি স্নিগ্ধছায়াতরুময় এবং সেখানে সীতার স্নানহেতু অতিশয় জল পবিত্র।

শুরু হলো যক্ষের নির্বাসিত জীবন। বিরহ যাতনায় শীর্ণ যক্ষের কনকবালায় বাহুস্খলিত হওয়ায় কান্তাবিরহে অধীর যক্ষ রিক্ত হয়। এসময়েই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে শৈল নিতম্বের আলিঙ্গনাবদ্ধ গজের ন্যায় একখণ্ড মেঘ সন্দর্শনে বিরহ-কাতর নতদেহ যক্ষের চিত্ত দূরবর্তী প্রিয়া দর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হৃদয়ের অশ্রু বাষ্পীভূত করে কুড়চিফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকেই সখা করে প্রীতিপূর্ণবাক্যে তার কুশল জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ধূম,

জ্যোতি, জল ও বায়ুর সমষ্টি সৃষ্ট অচেতন এই মেঘদল কী করে ইন্দ্রিয় সমর্থ হয়ে বিরহীর কাতর অনুভব পৌঁছে দেবে তার প্রিয়ার কাছে ? কীরূপেই বা মেঘখণ্ড হয়ে উঠবে বার্তাবাহক মেঘদূত ? এখানেই মহাকবি কালিদাসের সার্থকতা। কল্পনায় মেঘখণ্ডকে ইন্দ্রিয়ানুভব প্রদান করে মেঘের স্তুতি করে যক্ষ বলছে , "ওগো মেঘ, আমি জানি তুমি পুষ্কর এবং আবর্তক মেঘের বংশে জন্মগ্রহণ করছে , তুমি ইন্দ্রের প্রধান সহচর , তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী রূপগ্রহণ করতে পারো! অদৃষ্ট বশতঃ আমার প্রিয়া আজ দূরবর্তী , তাই তোমার কাছে আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি ; গুণবান ব্যাক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় তাও ভালো ; অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা সফল হলেও তা বরণীয় হতে পারে না। প্রিয়া সান্নিধ্য বঞ্চিত হৃদয়ের আর্তি কোন বাধ মানে না। আর মানে না বলেই কামার্ত দেহ-মন চেতন-অচেতন ভেদ জ্ঞান ভুলে গিয়ে বলে , "বায়ুপথে তোমাকে উড়ে যেতে দেখলে নারীদের মনে আশার সঞ্চার হবে , এইবার বুঝি মিলনকাল আসন্ন, তারা এলোচুলের প্রান্তভাগ তুলে নিয়ে তোমাকে দেখবে। মেঘকে উদ্দেশ্য করে বিরহীর এরূপ আর্তি অচেতন বাষ্পপুঞ্জকে বাস্তবত চৈতন্য রূপ না দিলেও এ দৃশ্যকল্প অসাধারণ নয়ন মনোহর হয়ে মননে ভাবরসের অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে

বিরহিণীর প্রাণ ধারণ কঠিন। অতএব, আসন্ন শ্রাবণে অশেষ প্রীতি সহকারে প্রণয়বচনযুক্ত স্বাগত সম্ভাষণে মেঘকে উদ্দেশ্য করে যক্ষ বলছে , "পথ তোমার জন্য মোটেই ক্লান্তিকর হবে না। যাত্রাপথে পাবে জল , পাবে ছায়া, শুনবে কিন্নরীদের গান। তুমি যখন উত্তর দিক থেকে যাত্রা করবে তখন তোমার দেহলগ্ন হবে ইন্দ্রধনু। তখন তোমার দেহে কতো শোভা বাড়বে বলো তো! এভাবেই পথবিহারে এক আনন্দময় যাত্রা শেষে তুমি কৈলাসে এসে পড়বে। এই কৈলাসের কোলেই অলকায় কুবেরর গৃহের উত্তরেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়া অবস্থান করছে। কল্পনা শক্তির কী অপূর্ব বিস্তার! যতবার মেঘদূত পড়েছি ততবারই এটিকে চলচ্চিত্র মনে হয়েছে।

_____***_____

চিত্রকলা

- মৌমিতা ঘোড়াই
(ষষ্ঠ সেমিস্টার, সংস্কৃত অনার্স)

কালিদাসের উপমা প্রয়োগে সাবলীলতার বিশ্লেষণ

-দীপিকা মাইতি
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

কবিকুল শিরোমণি, বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস। ব্যাস ও বাল্মীকির পরেই সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের অবস্থান অদ্বিতীয় ছিল। কালিদাস তাঁর কাব্যে ছন্দস্পন্দ, শব্দশৃঙ্খলা, বাক্যকল্পের মিথষ্ক্রিয়ায় এমন এক নান্দনিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন , যেখানে তিনি সবার থেকে স্বতন্ত্র। স্বমহিমায় তিনি তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। হিমালয়ের মতো বিশালত্ব ও বিস্তার নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কাব্যদেবীর হৃদয় মন্দিরে স্থান অধিকার করে। সাহিত্য বিশারদগণ কালিদাসের প্রতিভার সমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ মণি-মুক্তা পেয়ে তুষ্ট থেকেছেন, পুঞ্জীভূত মেঘমালার খানিক বর্ষণে উড়ন্ত ইন্দ্রিয় ও ভাসন্ত অনুভূতিকে তৃপ্ততা দিয়েছেন। অলংকারহীন সংস্কৃতকাব্যের কথা অকল্পনীয় বিষয় । একারণে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র। মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে এতো বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন যে, সেখানে অলংকারহীন একটি বাক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর । উপমা অলংকার প্রয়োগে কালিদাসের বিশিষ্টতা সর্বাধিক। একারণেই বলা হয়ে থাকে , "উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্" অর্থাৎ কালিদাস

উপমায় শ্রেষ্ঠ এবং ভারবি অর্থগৌরবে শ্রেষ্ঠ। উপমা হচ্ছে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে সৃষ্ট চমৎকৃতি। মহাপণ্ডিত পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ মনীষীগণ উপমা অলংকারকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। এই 'উপমা' প্রয়োগে কালিদাসের কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। উপমা সকল কবিই প্রয়োগ করে থাকেন; কিন্তু কালিদাসের উপমার প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন পাঠক মাত্রই বলে দিতে পারে, কোন উপমাটি কালিদাসের, কোনটি তাঁর নয়। অন্যান্য কবির সাথে কালিদাসের উপমার এটাই প্রভেদ। কালিদাসের উপমার এমন এক সাবলীলতা, এমন এক লালিত্য, এমন এক ঔচিত্য আছে যা অন্যান্য কবির সাথে দুর্লভও। হয়তো একই উপমা উভয়েই প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কালিদাসের লেখনীতে তাহা এক অপূর্ব রমণীয়তা ধারণ করে। সেই কালিদাসের উপমাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) শাস্ত্রীয় উপমা (২) প্রকৃতিক উপমা (৩) মূর্ত অমূর্ত উপমা (৪) লৌকিক উপমা।

(১) শাস্ত্রীয় উপমাঃ - এই শ্রেণীর উপমা বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অন্তর্গত মনে হয়। রঘুবংশ মহাকাব্যে মহারাজ দিলীপের স্ত্রী সুদক্ষিণা কামধেনর কন্যা নন্দিনীকে অনসরণ করেছিলেন। যেমন-

অপবাদ ইবোৎসর্গ ব্যাবর্তয়িতুমীশ্বরঃ (রঘু-১৫ /৭) অর্থাৎ অপবাদ সূত্রকে উপসর্গের নিয়ম অনুসারে আবদ্ধ করা যায়। ঠিক তেমন শত্রুঘ্ন লাবাণক অসুরকে বেঁধে ছিলেন।

(২) প্রকৃতির উপমাঃ - কালিদাস প্রকৃতির উপমা প্রয়োগ ব্যাপক করেছিলেন। তার লেখনীতে নায়ক নায়িকার সৌন্দর্য চিত্রণ যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রকৃতিকে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে তুলে ধরেছেন। যেমন পুষ্প, লতা, নগর, সূর্য, চন্দ্র, ঋতু ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে তাঁর কাব্যে উপস্থিত হয়েছে। দিলীপ ও সুদক্ষিণার মধ্যে গাভীর সৌন্দর্য, দিন ও রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যার সৌন্দর্য, ''দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ''। (রঘু-২ /২০) ''পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকবিনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'' অর্থাৎ স্তনের ভারে ঝুঁকে থাকা পার্বতী সঞ্চারিণী লতার সমান প্রতীতি হচ্ছে। শকুন্তলার অধর কিশলয় সমান, বাহু দুটি কোমল, যৌবনে পুষ্পের সমান অঙ্গ সমূহ সংযুক্ত হয়ে আছে।

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।। (অভিজ্ঞান-১-১৯) অর্থাৎ অধর নতুন পাতার মত রক্তাভ, দুই বাহু যেন কোমল শাখা, আর সারা অঙ্গে ফুলের মত লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে। মালোপমা যুক্ত বিভূষিত শকুন্তলার সৌন্দর্য রোমাঞ্চকর মদোন্মত্ত করে দেয়-

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।

অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।।(২/১০)

অর্থাৎ শকুন্তলা যেন এমন এক ফুল যার ঘ্রাণ এখনো কেউ গ্রহণ করেনি, এমন এক নতুন পল্লব যাকে এখনো কেউ নখ দিয়ে ছিন্ন করে নি, এমন এক নব মধু যার আস্বাদ এখনো কেউ গ্রহণ করেনি, নিষ্কলঙ্ক সেই রূপ যেন পুণ্যরাশির এক অখণ্ড ফল। জানিনা, একে ভোগ করার জন্য ভগবান কাকে এনে হাজির করবেন।

(৩) মূর্ত অমূর্ত উপমাঃ - এই শ্রেণীতে কবি মূলত মূর্ত ও অমূর্ত ভাব উপমার স্বীকার করেছেন। রঘুবংশ মহাকাব্যে রাজা দিলীপ সাক্ষাৎ ক্ষাত্র ধর্মের সমান ছিলেন। 'ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ' (রঘু -১/১৩) এক অন্য উপমা রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল- 'ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্' (রঘু-৩ /১৩)। রামের চার ভাইয়ের পুরুষার্থ সমান ছিল – 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গভাক্' (রঘু.- ১০/৮৪)

(৪) লৌকিক উপমাঃ – কালিদাসের কাব্যে অনেক লৌকিক উপমার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন রঘুবংশে -

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।। (রঘু-৬/৬৭)

অর্থাৎ যেমন রাত্রে দীপশিখা নিয়ে চলে গেলে রাজপথ অন্ধকারে ডুবে যায়, তেমনি ইন্দুমতী রাজাকে ত্যাগ

করে যাওয়া সময় বির্বণ বদন হয়েগেছিল। 'মেঘদূত' কাব্যে কালিদাস অজস্র উপমার ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনটিই অনাবশ্যক নয়। উপমার পর উপমা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর শ্লোকের রাজ্য ; উপমার প্রাদুর্ভাবে এ রাজ্যখানি হীরার খনির ন্যায় ঝলমলে ও সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। যা দেখে অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে মহাকবিকাব্য কামধেনু স্বরূপ । তবে তাঁর কাব্যের সবচেয়ে বড় অলংকার হল কবি সংযম । উপমা প্রয়োগের ভেতর কালিদাসের কাব্যে যে জিনিসটি আমাদের চিত্তকে গভীরভাবে দোলা দেয়, তা হল কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। পরিশেষে বলা যায় যে আজ ও মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের দরবারে আপন প্রতিভার গৌরবে কালিদাস যে স্থান অধিকার করেছিলেন , আজ ও সেই আসনের অধিকারী শুধু কালিদাস।

_____***_____

ভারতীয় আর্দশ নারী চরিত্রে শকুন্তলার বিশ্লেষণ

-মৌমিতা ঘোড়ই
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

সংস্কৃত কাব্য কাননে নাট্যকার রূপে কালিদাস যেন প্রস্ফুটিত পারিজাত। তাঁর রচিত তিনখানি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাদের মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' কালিদাস-এর সর্বস্ব গ্রন্থ - "কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রণয় নাটকটির বিষয়বস্তু। এই শকুন্তলা মহাভারতে বর্ণিতা শকুন্তলা নয়। এই শকুন্তলা কালিদাসের মানস প্রতিমা। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। মাতা মেনকার দ্বারা পরিত্যক্ত শকুন্তলাকে মহর্ষি কন্ব সন্তাহস্নেহে লালন পালন করেন। এই শকুন্তলা-হরিণীর মতো চঞ্চলা এবং প্রকৃতিকন্যার মতো সরলা। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার চরিত্রের যে অসামান্য বৈশিষ্ট্য গুলি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেগুলি হল -

অনুপম সৌন্দর্য্য : রূপ ও লাবণ্য শকুন্তলার সহজাত। ষোড়শ-সপ্তদশ বর্ষীয় অনুপম সুন্দরী শকুন্তলার যৌবন ও তার স্বভাব তার লাবণ্যকে যেন আরও বর্ধিত করেছে। হস্তিনাপুরাধিপতি দুষ্যন্ত প্রথম দর্শনেই শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে প্রথম অঙ্কে

সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে-

"অধর: কিশলয়রাগ: কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।।"

অর্থাৎ তার অধর কচি পাতার মতো রক্তিম , বাহুযুগল লতার মতো কোমল এবং সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে কুসুমের মতো যৌবন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

মুগ্ধা নায়িকা : শকুন্তলা ছিলেন মুগ্ধ নায়িকা। দুষ্যন্ত তাই বলেছেন - "মুগ্ধাসু তপস্বী কন্যাসু।" তার মনে যেমন সারল্যের স্বচ্ছলতা, চোখে তেমন স্বপ্নের কিরণ। তিনি বিশ্বাসের মানদন্ডে সকলকে ভালোবাসেন। তাই তো তিনি সহজেই দুষ্যন্তের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কখনোই শকুন্তলার মানসিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গুরুজনদের প্রতি ভক্তি : শকুন্তলা গুরুজনদের প্রতি সর্বদা সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। দুষ্যন্তের প্রতি ও তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

সংকোচপরায়ণা : শকুন্তলা অতি সংকোচপরায়ণা ও মুগ্ধা নায়িকা। তিনি অত্যন্ত বিরহী হয়েও প্রিয় সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কাছ থেকে মনের অনুরাগের কথা বলতে পারেন নি। অনেক দু:খ-কষ্টের পর সে খুবই সংকোচের সঙ্গে মনের কথাটি বলেছেন।

প্রকৃতিপ্রেম : শকুন্তলার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। তার স্নেহ রসে সমগ্র তপোবন যেন প্লাবিত। তরুলতার জলসেচন না

করে তিনি কখনো জল পান করতেন না। সহকার তরুর সঙ্গে বনজ্যোৎস্না লতার বিবাহ দিয়ে শকুন্তলা পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। গাছে ফুল ফোটার সময় আনন্দের সীমা থাকে না। হরিণ শাবকগুলিকে তিনি মাতৃস্নেহে লালন পালন করতেন। তাইতো পতিগৃহে যাত্রাকালে আশ্রমের সামান্য বৃক্ষলতা থেকে শুরু করে ময়ূরময়ূরী , এমনকি মাতৃহারা হরিণ শিশুটিও তার আঁচল ধরে টেনেছিল-

"উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরা:।
অপসৃতপান্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রুণীব লতাঃ।।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেছেন - লতার সাথে ফুলের যেমন সম্বন্ধ , প্রকৃতির সাথে শকুন্তলার তেমনই সম্বন্ধ।

পতিপ্রাণা : শকুন্তলা ছিলেন পতিগতপ্রাণা। স্বামীর চিন্তায় বিভোর থেকে তাকে দুর্বাসা মুনির অভিশাপ ভোগ করতে হয়েছে। পতির সঙ্গে মিলনের আশায় তিনি বিরহের দু:খকে বরণ করেছেন। তিনি সমস্ত দু:খকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে স্বীকার করেছেন। দুষ্যন্তও পরিশেষে বলেছেন -

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি।।"

আত্মসম্মানবোধ : কোমলা, সরলা, লজ্জাশীলা শকুন্তলা দৃঢ় চেতনার প্রতীক। গান্ধর্ব বিবাহকে দুষ্যন্ত অস্বীকার করেছেন। দুষ্যন্তের কথাগুলি শকুন্তলার জ্বলন্ত আগুনের

মতো মনে হয়েছে। শকুন্তলা নারীত্বের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে দুষ্যন্তকে - ধর্মকঞ্চুক , অনার্য, তৃণাচ্ছন্ন কূপ ইত্যাদি বলে তিরস্কার করেছেন। এখানে শকুন্তলার চারিত্রিক দৃঢ়তা , নারীত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে মহাকবি কালিদাসের প্রতিভাস্পর্শে শকুন্তলার চরিত্রটি নারীত্বের অপূর্ব গৌরব মহিমায় মন্ডিত হয়ে ভারতীয় আদর্শ নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

_____***_____

কালিদাসের জন্মস্থান বিষয়ে পর্যালোচনা

-স্বাতী মণ্ডল
সংস্কৃত অনার্স
চতুর্থ সেমিস্টার

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের নিখিল কবিচক্রচুড়ামণি কালিদাসের কালনির্ণয় একটি বিতর্কিত ও বিবাদগ্রস্থ বলা যেতে পারে। তবে তাঁর জন্মের ফলে আমাদের এই ভারতভূমি পবিত্র হয়ে ওঠে। তবে কালিদাস বলতে আজ আমরা শুধু এক ব্যক্তিকেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণযুগকে বুঝি - যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাকবি কালিদাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকগণের ন্যায় দেশ-কাল ও জীবনচর্যা সর্ম্পকেও যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কোন নগরীতে কোন কালে কালিদাসের জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এই কবির সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতি গড়ে উঠেছে। সাধারণত কালিদাসের জন্মস্থান প্রদেশের নামের উল্লেখের সাথে অনুমান করা যায়।

১। বঙ্গপ্রদেশ - পণ্ডিতদের মতে মহাকবি কালিদাস বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কেননা বেশীরভাগ মানুষ 'কালি' শব্দ থেকে অনুমান করেন মহাকবি

খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তবে কবির রচনাগুলি অধ্যয়ন করলে এই যুক্তি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়, কেননা তার সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে কোথাও তিনি কালীদেবীর উল্লেখ করেন নি। তবে কালিদাসকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না । কারণ তিনি তাঁর লেখনীর সাহায্যে বিদ্যাদাত্রী কালীদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করতে পারতেন। কিন্তু আমরা এইরূপ উদাহরণ কোথাও দেখতে পাই না।

২। মিথিলা - কিছু পণ্ডিতগণ তার জন্মস্থান হিসেবে 'মিথিলা'কে মনে করেন। তবে কালিদাস তাঁর লেখনী শৈলীতে কোথাও মিথিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা , সেখানকার বাসিন্দা, বিখ্যাত লোকগীতি বা সেখানকার হাস্যরসাত্মক কৌতুকের বর্ণনা উপস্থাপন করেননি। সুতরাং এই মতামতও ত্রুটিযুক্ত বলে মনে হয়।

৩। বিদর্ভ বা বিদিশা - পিটারসন কালিদাসকে 'বিদর্ভ'-দেশের অধিবাসী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায়-

(ক) কালিদাসের রঘুবংশগ্রন্থে বিদর্ভ রাজকন্যা ইন্দুমতির জন্ম ও বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় । তেমনি তাঁর বিখ্যাত নাটক 'মালাবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর নায়িকা মালবিকাও বিদর্ভ রাজার কন্যা।

(খ) লেখার অনেকগুলি রীতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মহাকবি তাঁর কবিতাগুলিতে 'বৈদর্ভী-রীতি' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে । এর থেকে বোঝা যায় যে বিদর্ভের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণের সাক্ষ্য রাখে।

(গ) হরপ্রসাদশাস্ত্রী মতে কালিদাস বিদিশাবাসী ছিলেন। তার লেখনশৈলীর মধ্যে বিদিশার বর্ণন, সমীপস্থ গিরি, সিন্ধু আদি নদীর বর্ণন পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে কালিদাস বিদিশা নগরীর অধিবাসী ছিলেন।

৪. কাশ্মীর - মহাকবি কালিদাসের রচনাতে কাশ্মীরের শৈলী দেখা যায়। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু তত্ত্ব তুলে ধরা হচ্ছে – (ক) কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যে হিমালয়ের যে বর্ণ না পাওয়া যায়। তা মূলতঃ কাশ্মীর বাসীর হিমালয়। (খ) মেঘদূত গীতিকাব্যে নায়ক যক্ষের জন্ম অলকা হিমালয়ে হয়েছিল। (গ) কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' এর নায়ক পুরূরবা তথা নায়িকা ঊর্ব্বশীর প্রেমলীলার মুখ্যস্থান গন্ধমাদন পর্বত ছিল। তবে এই পর্বতটি কাশ্মীরের অবস্থিত ছিল। (ঘ) মহর্ষি কণ্ব, বশিষ্ঠ এবং মারীচ এই ঋষিদের আশ্রয়স্থল হিমালয় ছিল। এটি কাশ্মীরের সিন্ধু নদী তটে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। (ঙ) কাশ্মীরে কহারবর্গকে নিন্দিত জাতি বলে উল্লেখ করা হয়। এই জাতির মানুষেরা মৎস্য জীবিকার সাথে যুক্ত থাকেন। তাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে ধীবর বলতে এই জাতি সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। (চ) শৈবসম্প্রদায় কাশ্মীরের পাদদেশে অধিবাসী ছিলেন তাই কালিদাসের মঙ্গলাচরণে শিব দেবতার স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়।

৫। অলকা - প্র ফেসর সূর্যনারায়ণ ব্যাস প্রভৃতিরা অলকাকে কালিদাসের জন্মস্থান হিসাবে বিবেচনা করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত গণ মনে করেন যে অলকা কবির মন্দির, আনন্দ ও স্বপ্নের একমাত্র স্থান ছিল। তাই কবি কল্পনা করতেন এবং তার সাথে ইন্দ্রধনুষরঙ্গ প্রদান করতেন।

৬। উজ্জয়িনী – উজ্জয়িনীর প্রতি কবির বিশেষ প্রেম ছিল। কেননা মেঘদূত কাব্যে উজ্জয়িনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। এ র সুন্দর বৈচি ত্র্য কবির লেখন শৈলীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে - যা ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। এখানে নায়িকাদের অভিসার যাত্রার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই নগরীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কালিদাস স্বর্গের সৌন্দর্যকে খর্ব করে দিয়ে বলেছেন যে-

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।।

(পূর্বমেঘ-৩০)

অর্থাৎ সুকৃতের ফল ক্ষয় হলে যখন স্বর্গবাসীরা ধরায় ফিরে আসেন তখন তাঁরা যেন অবশিষ্ট পুণ্য বলে একখণ্ড স্বর্গ পান। এখানে স্বর্গের এক কমনীয় খণ্ড রূপে উজ্জয়িনীকে বলা হয়েছে। এমনকি ছোটো নদী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রদ্ধার সাথে প্রদর্শিত হয়েছে।

মেঘদূতে উজ্জয়িনী নদী, শিপ্রা নদী এবং মহাকালের মন্দিরের সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে কবির উজ্জয়িনীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব এবং উজ্জয়িনীর ভৌগোলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বেশিরভাগ পন্ডিত উজ্জয়িনীকে কালিদাসের আবাস হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

উপসংহার - উপরোক্ত দুটি যুক্তির মধ্যে কাশ্মীরকে এবং উজ্জয়িনীকে সমীচীন মনে করা হয় । দেখে মনে হয় মহাকবি কাশ্মীর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার যৌবনের প্রথমার্ধটি একটি মনোরম প্রকৃতির ক্রোড়ে বেড়ে উঠেছে যা উজ্জয়িনী নগরীকে নির্দেশ করে। অতএব মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান কাশ্মীর ছিল, আর উজ্জয়িনীকে কবির কর্মস্থল হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

-------***-------

চিত্রকলা

- মৌমিতা মান্না

(চতুর্থ সেমিস্টার, সংস্কৃত অনার্স)

“প্রকৃতির কবি কালিদাস” – সমীক্ষাত্মক আলোচনা

- সাহেবা খাতুন
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

“তুমি প্রকৃতির কবি,
জীবন পথের সংগীতে আনো
চির সহ্যের ছবি”।।

প্রকৃতির কবি কালিদাস তাঁহার কাব্য ও নাটকে প্রকৃতিকে এমন আপন করে বর্ণনা করেছেন যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গাঢ় অন্তরঙ্গতার ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। জড় ও প্রকৃতিকে ভাবপ্রবণ করে বর্ণনা করায় কালিদাসের কবিত্ব শক্তির অনুপম বিকাশ ঘটেছে। কবি ও সাহিত্যিক মাত্রই প্রকৃতির বিচিত্র চিত্রকর । তথাপি যে সাহিত্যিকের রচনামুকুরে প্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয় তিনিই প্রকৃতির কবি হিসেবে আখ্যাত হন । প্রকৃতি ও মানবজীবন অবিচ্ছিন্ন , প্রকৃতিবিহীন মানবজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না । মানবজীবন বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়ক প্রকৃতিরূপ উপাদান। মহাকবি কালিদাস তাঁর প্রতিটি কাব্যে প্রকৃতিকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি প্রকৃতিকে সজীব ও সক্রিয় করে এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন।

ঋতুসংহারে ঋতুগুলির জ্বলন্ত বর্ণনা কতই হৃদ্য হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের প্রতিছত্রে সুবিন্যস্ত প্রকৃতি যেন প্রেমিকারূপে অবতীর্ণা। তাই এদের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য।

প্রকৃতির কাব্য মেঘদূত । এখানে অচেতন নীরোদপুঞ্জ চেতনা রূপে হৃদয়ের সন্দেশ বহন করে । কবি মেঘদূতে নির্বাসিত যক্ষের বিরহবার্তা বহনে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করে যেন জীবন্ত দূতকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করেছেন। 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যটিতে হিমগিরির সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের সৌন্দর্য ও প্রকৃতির মোহন সাজে তরুলতা, পশুপক্ষী নব নব সাজে সজ্জিত হয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। কবি মানব মনের দুঃখের সহিত সমগ্র প্রকৃতিকে সমদুঃখপ্রবণ করে অঙ্কিত করেছেন । তাই সীতার দুঃখে ভাগীরথী তরঙ্গভঙ্গে যেন হস্ত উত্তোলন করে লক্ষ্মণকে সীতা নির্বাসনে বাধা দিয়েছে । সীতার দুঃখে তরুলতা, মৃগী, ময়ূর সকলেই অশ্রু বিসর্জন করেছে কবির ভাষায়-

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেহপি।।
(রঘু. ১৪/৬৯)

কবি কাব্যে যেমন প্রাকৃতিক বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত , নাটকেও প্রাকৃতিক বর্ণনায় অনুরূপ শৈলী প্রদর্শন করেছেন । বিক্রমোর্বশীয় নাটকে উর্বশীর অনুসন্ধানে রাজা করুণ গাথা গেয়ে ময়ূর , কোকিল, হংস, নদী, পর্বত প্রভৃতি সকলের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদন যেন অমানুষ জীব ঐ পশুপক্ষীদের নিকট পরম সংবেদনীয় হয়ে উঠেছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে কমনীয় কলেবরা, অনুপমরূপ

লাবণ্যা তন্বী মালবিকাই যেন প্রকৃতি দেবীর প্রতিমূর্তিরূপে আবির্ভূতা।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে - প্রকৃতিকে সজীব করে চিত্রাঙ্কনে কবি কালিদাস বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন । তাঁর বিশ্বজয়ী এই নাটক ধ্রুবতারার মতো ভাস্কর হয়ে আছে। এটি এমনই একটি নাটক যে তা বিশ্বের অন্যত্র দুর্লভ । এই নাটক যথার্থই প্রকৃতির রাজ্য । এখানে দেখি শকুন্তলা সোদরস্নেহে সকল লতাগুল্মের প্রতি যত্ন করেন। প্রতি লতাবৃক্ষে জলসিঞ্চন করা তাঁর নিত্য কর্তব্য। তিনি নবমালিকার কথা ভুলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি আশ্রমের মৃগশিশুকে স্নেহে লালন পালন করেন । কুশভক্ষণে ক্ষতমুখ মৃগের ক্ষতে ঈঙ্গুদী তৈল প্রক্ষেপ করেন। পদ্মপত্রে প্রেমপত্র রচনা করেন, তদ্বারা স্তনাবরণ দেন, পুষ্প শয্যায় শয়ন করে আত্মবিনোদন করেন। এর সমস্ত অঙ্কই যেন প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠিত । প্রথমাঙ্কে কৃষ্ণসার মৃগের বক্রগ্রীবায় পশ্চাৎ অবলোকন এবং দুষ্যন্তের শরপতনের ভয়ে তার দ্রুত উল্লম্ফন পরম শোভাজনক। কণ্বের আশ্রমবৃক্ষতলে পতিত নীবারধান্যকণা, মৃগসমূহের নির্ভয়ে বিচরণ , নবপল্লব, ধূমরাজি, ভ্রমরশোভিত কেশরদাম , নবমল্লিকা, সপ্তপর্ণছায়া আশ্রম শোভাকে কি অপরূপ করে তুলেছে । দ্বিতীয় অঙ্কে ঘন সন্নিবিষ্ট লতাকুঞ্জ নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কে মালিনীতীরে বেতস বনে লতাকুঞ্জ, মৃদু সমীকরণ, সুমিষ্ট পদ্মগন্ধ প্রাকৃতিক শোভা বিবর্ধিত

শকুন্তলায় প্রকৃতির প্রগাঢ় প্রীতি বর্তমান। তাই পতিগৃহে গমনকালে বৃক্ষগুলি অমূল্য আভরণ , শুভ্র পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে যেন তাহাকে সাজাবার ব্যবস্থা করেছে । অনুকূল বায়ু ও কোকিল রব তাঁর শুভযাত্রায় সমর্থন জানায়। কণ্বের সঙ্গে সখীদ্বয় যেমন শোকাচ্ছন্ন, প্রকৃতিও তেমন বেদনা-বিধুর, ময়ূর দুঃখে নৃত্য পরিহার করছে । মৃগশিশু বস্ত্রাঞ্চল ধরে টানছে । পত্রপাতনের দ্বারা বৃক্ষগুলি যেন অশ্রুপাত করছে।

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখি জলধার।
-রবীন্দ্রনাথ (প্রাচীন সাহিত্য)

পঞ্চমাঙ্কে হস্তিনাপুরে নাগরিক পরিবেশ বিরুদ্ধ মনে হলেও সেখানে বল্কল পরিহিত গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় প্রাকৃতিক শোভার কারণ হয়। 'প্রভূত' শব্দ হতে প্রকৃতির স্মৃতি মনে সাড়া জাগায়। ষষ্ঠ অঙ্কে প্রমোদ বনে বসন্ত শোভা, মাধবী-কুঞ্জ আবার প্রকৃতির পূর্ণতা আনয়ন করে। সপ্তমাঙ্কে দেখা যায় প্রবহমান বায়ু ও মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে স্বর্গ হতে দুষ্যন্তের মর্ত্যে অবতরণ । মারীচাশ্রমে মন্দার, কল্পবৃক্ষ, আশোকতরু ও পদ্মহ্রদ কতই শোভার কারণ হয়। এক কথায় বলা যায় প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে যেন কালিদাসকে চিন্তা করা যায় না।

সমগ্র প্রাচ্যদেশ তথা পৃথিবী যে সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে ঋণী, সেই সংস্কৃত সাহিত্যকে মহাকবি কালিদাস প্রতিভারূপ অমরাবতীর অমৃত দ্বারা অভিসিঞ্চিত করেছিলে। তাঁর কাব্যবীণার সুরধ্বনি সে যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত **রাইডার** বলেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যে মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতি অন্তরঙ্গতায় একাত্ম হয়ে উঠেছে।

কালিদাসের দৃষ্টিতে হিমালয়

- সঞ্চিতা বর্মন
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

কবিকুলধর মহাকবি কালিদাস বিরচিত কুমারসম্ভব মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। সপ্তদশসর্গে নিবদ্ধ এই মহাকাব্যটিতে মহাকবি হিমালয়ের বর্ণনা, পার্বতীর জন্ম বৃত্তান্ত, তার সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য ক্রমশঃ শিব পার্বতীর বিবাহ এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা স্বকীয় বর্ণনা নৈপুণ্যতায় প্রস্ফুটিত করেছেন। সেগুলির মধ্যে প্রথম এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় প্রথম সর্গে গিরিরাজ হিমালয়ের স্বরূপ বর্ণনায়। এখানে মহাকবি নিজের কাব্যিক চাতুর্যের দ্বারা ব্যঞ্জনাবৃত্তির তুলিকায় ভারতীয় সৌন্দর্যের আদর্শ চিত্রিত করেছেন। মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষের উত্তরেস্থিত পর্বতরাজ হিমালয়ের বর্ণনার দ্বারা তার কুমারসম্ভব মহাকাব্যটি প্রারম্ভ করেছেন । দেবতাদের অধিষ্ঠানভূমি পর্বতরাজ হিমালয় ভূমন্ডলের উত্তরদিকে ব্যাপ্ত করে আছে। পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করে পৃথিবীর মানদন্ডের মত বিরাজমান। এই প্রসঙ্গে তাই ব্রহ্মান্ডপুরাণে যথার্থই উক্ত হয়েছে-

"কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণে বর্ষপর্বতৌ।
পূর্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তরূপস্থিতৌ।।"

-(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-৮ম.ধ্য-৭৮)

ভারতের উত্তরে অধিষ্ঠাতৃদেবতাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ও

হিমানীর দ্বারা পরিবৃত্ত হওয়ায় হিমালয় নামে পরিচিত। সমস্ত পর্বতগণ যাকে গোবৎস স্বরূপে রেখে পৃথিবীর রত্নমহৌষধিরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিল , সেই হিমমন্ডিত হিমালয় অত্যন্ত মনোহর। সেখানে স্থিত গৈরিকাদি ধাতুসমূহ অপ্সরাগনের শৃঙ্গার বিলাসের অলঙ্কার ছিল , যে ধাতু গুলিতে আকাশে ভাসমান মেঘখন্ডগুলি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। হিমালয়ের উচ্চতা গগনচুম্বি হওয়ায় মেঘখন্ডগুলি সেই হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত যেতে সমর্থ ছিল। তাই তার শিখর প্রদেশেস্থিত যক্ষগণ তখন সূর্যতাপে কষ্ট অনুভব করছিল। হিমালয় এতই সুউচ্চ ছিল যে সেখানে মেঘ ও পৌঁছতে পারছিল না। এই হিমালয় পর্বতের উপর বিদ্যাধর সুন্দরীগণ গজবিন্দুর ন্যায় লালভূর্জ্জপত্র ধাতুরসের দ্বারা নিজের প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে সংবাদ লিখে প্রেমপত্র পাঠাচ্ছিল সেই হিমালয়ে হস্তীসমূহ গন্ডস্থলের মত্ততা মেটানোর জন্য দেবদারু বৃক্ষকে ঘর্ষণ করে তা থেকে দুগ্ধ নিঃসরণ করে চারিদিকে সুগন্ধিত করছিল। রাত্রিতে প্রকাশিত মহৌষধিগুলি সুরত প্রদীপের কাজ করছিল। কবির ভাষায়-

বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ।।

(কুমার-১/১০)

সাধারণতঃ দেখা যায় যখন কেউ গান আরম্ভ করে তখন তার পূর্বে অপর জন নিজের মুখের বায়ু ও বাঁশির দ্বারা গীত সঙ্গীতের স্বরে সুর দেয়। সেইরূপ যখন দেবযোনির কিন্নরগণ গান্ধারস্বরে গান আরম্ভ করে তখন তার পূর্বে

এই হিমালয় কন্দরা বায়ুর দ্বারা কীচকসমূহের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করে যেন সেই গানে স্বর দিতে চাইল। হিমালয় দিনের বেলায় ভীত পেঁচার ন্যায় গুহায় লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে সূর্যের কাছ থেকে রক্ষা করছিল। হিমালয় অত্যধিক হিমের ফলে পথের সর্বত্র ঘনীভূত বরফ ছিল সেখানে পথিকদের পদাঙ্গুলি সমূহ ক্লেশপ্রাপ্ত হচ্ছিল। হিমালয় সত্যিই পর্বতকুলের রাজা। তার অধিত্যকাপ্রদেশের অভ্রভেদী দেবদারু গাছগুলির শ্যামল পত্রবিতান হিমালয়ের মাথার উপর রাজছত্রের কাজ করে। অসংখ্য চমরী মৃগের জ্যোৎস্নার মত সাদা সাদা কোমলপুচ্ছবিশিষ্ট লেজগুলি দোলাতে দোলাতে যখন চারিদিক ঘুরে বেড়ায় , তখন চামরের মত লেজগুলির শোভায় গোটা হিমালয়টা ভরে যায়। মনে হয় ঐসব চমরীসুন্দরীরা পর্বতরাজকে চামর দুলিয়ে বাতাস করছে। এখানে মহাকবি অত্যন্ত বর্ণনা নৈপুণ্য সাধারণ চামরীপুচ্ছের সঙ্গে রাজচামরের তুলনা সত্যিই অসাধারণ-

লাঙ্গূলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ।।
(কুমার-১/১৩)

সেখানকার গুহাগুলির মুখে থাকা মেঘখন্ডগুলি ঘরের পর্দার অনুরূপ আর সেখানে গঙ্গাজলের দ্বারা সম্পৃক্ত বায়ুর সেবন কিরাতগণের কাছে সুখপ্রদ। এই হিমালয়ের শিখরপ্রদেশে স্থিত সরোবরের কমলসমূহ নিত্যক্রীড়ায়রত যেগুলি সপ্তর্ষিগণ দৈনিক পূজনের জন্য নিজের হাতে চয়ন করতেন সেই কমলগুলিকে প্রস্ফুটিত করার জন্য

নিম্নমুখযুক্ত সূর্য ঊর্ধ্বমুখী হত। তাই এইরূপ হিমালয়কে প্রজাপতি যজ্ঞভাগ প্রদান করেছিলেন এবং হিমালয় থেকে যজ্ঞসাধন দ্রব্যসমূহের উৎপত্তির কারণ ও পৃথিবীকে ধারণ করার জন্য পর্বতগণের স্বামীরূপে স্বীকার করেছিলেন-

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিতযজ্ঞভাগং শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ।।

-(কুমার-১/১৭)

কালিদাস প্রকৃতির অন্যন্য উপাসক ছিলেন। তিনি চোখের সামনে এই বিস্তৃত প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যগুলিকে অত্যন্ত কাব্যিক নৈপুণ্যতায় উপস্থাপিত করেছেন। মানব ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং অদ্ভুত সমরসতা কবি এই কাব্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা সত্যিই অদ্ভূত। তাই মহাকবি কালিদাসের প্রসঙ্গে মল্লিনাথ বলেছেন যে কালিদাসের বাণীর রহস্য কেবল তিনজনই বুঝেছেন - একজন হলেন বিধাতা ব্রহ্মা, দ্বিতীয়জন বাগ্দেবী সরস্বতী ও তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং কালিদাস -

কালিদাসগিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতী।
চতুর্মুখোঽথবা সাক্ষাদ্ বিদুর্নান্যে তু মাদৃশাঃ।।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে অশোক পুষ্পের সমীক্ষা

-রুনী মাইতি
সংস্কৃত অনার্স
ষষ্ঠ সেমিস্টার

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি হলেন মহাকবি কালিদাস। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাঁর কাব্যের সুধা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা পান করে চলেছি , তবুও আজো তা এতটুকুও রসহীন বলে মনে হয় না। সমকালীন সাহিত্যের যুগে আজও কালিদাসের কাব্য অমৃত নির্ঝর হয়ে রয়েছে কাব্যরসিকের কাছে। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর সময়ের সামাজিক অবস্থার চিত্র আমরা পাই। কালিদসের কাব্যে পাহাড় , পর্বত, নদী, গাছপালা, ঝর্ণা, মেঘ, ফুল, পশু, পাখি এদের বর্ণনা পাই। কালিদাস তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ধরনের ফুলের কথা বর্ণনা করেছেন যেমন - পদ্ম, বকুল, কুমুদ, কর্ণিকা, জবা, কেতকী, অশোক, যূথিকা, পলাশ, চূতমঞ্জরী, লবঙ্গ, শেফালিকা, লোধ্র, কুসুম, স্থলকমলিনী, মধূক, নবমল্লিকা বিভিন্ন ফুল। এদের মধ্যে অশোক ফুল অন্যতম। "পাদাহতঃ প্রমোদয়া বিকশত্যশোকঃ।" সে কালে অশোক ফুল ফোটাতো নারীর চরণাঘাতে। তখন নারীর পায়ে জুতো ওঠে নি , কুমুদের পাঁপড়ির মতো শুভ্রচরণদুটির প্রান্তদেশ রাঙা হোতো অলক্তকে। সে চরণের স্পর্শে অশোক কি ফুল না ফুটিয়ে পারে। একালেও অশোক ফুল ফোটায় কিন্তু সে আধুনিকা রমণীদের হিলওয়ালা জুতো পরা ত্রিভঙ্গ

চরণের স্পর্শে নয়। এদের চরণের স্পর্শে ফুল ফোটে না ফুল শুকিয়ে যায়। অশোক যে শুধু সেকালের বরাঙ্গনাদের প্রিয় ফুল ছিলো তা নয়, কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিলো অশোক। তাঁর কাব্যে অশোক বার বার দেখা দিয়েছে। 'মেঘদূতম্' কাব্যের উত্তর মেঘ খণ্ডে মহাকবি বলেছেন-

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ।।১৭।।

অর্থাৎ সেখানে কুরুবক বেষ্টিত মাধবী মণ্ডপের সন্নিকটে কম্পমান কিশলয়যুক্ত রক্তাশোক ও কমনীয় বকুলবৃক্ষ আছে। একটি আমারই ন্যায় তোমার সখির বামপদ কামনা করে , অন্যটি দোহদচ্ছলে তার বদনমদিরা আকাঙক্ষা করে। কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে অশোকের উল্লেখ করেছেন বহুবার। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেই দেখি পরিচারিকা সমাহিতিকা বলছেন- "এষা তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি। যাবদেনাং সম্ভাবয়ামি।।"
রক্ত অশোকতরুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মধুকরিকা। যাই তাঁর সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে। দুই সখিতে আলাপ চললো। দাড়িম্ব ফল নিয়ে সমাহিতিকা গমনোদ্যতা । তখন মধুকরিকা বললেন - "সখি! সমমেব গচ্ছাবঃ। অহমপ্যস্য চিরায়মাণকুসুমোদ্গমস্য তপনীয়াশোকস্য দোহদনিমিত্তং

দেব্যৈ নিবেদয়ামি" অর্থাৎ সখি! একটু দাঁড়াও একসঙ্গে যাবো দুজনে। এই অশোক তরুতে ঠিক সময়ে ফুল ফোটে নি। আমি দেবীর কাছে গিয়ে অশোকতরুর দোহদ দেবার জন্যে আবেদন করবো।

নৃপতি অগ্নিমিত্র বিদূষকের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করছেন , এমন সময়ে মালবিকা এলেন সেই উদ্যানে। মালবিকা নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে কতো না কথা বলছেন। প্রিয়তমকে অভিলাষ করে শুধু বেদনাই পেয়েছেন আর পেয়েছেন লজ্জা। এইসব কথা ভাবছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো দেবীর আদেশ – 'আম্ আদিষ্টাস্মি দেব্যা' - আঃ, মনে পড়েছে। দেবী আমাকে আদেশ করে বলেছেন- বিদূষকের চপলতায় দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছি। তাই তুমি গিয়ে অশোক তরুর দোহদসম্পন্ন করে এসো।

উদ্যানে ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়লো অশোক তরু। মালবিকা বললেন - "অয়ং স সুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীতকুসুমনেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মম অশোকঃ অনুকরোতি। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিষণ্ণা আত্মানং বিনোদয়ামি" - অর্থাৎ এই সেই অশোক তরু। সুকুমার দোহদের অপেক্ষায় ফুলহীন এই অশোক আমারই মতো যেন কার অপেক্ষা করে আছে। যাই, ওর ছায়াতলে শিলাফলকে বসে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিই। প্রমোদ-কাননে নৃপতি অগ্নিমিত্র বেড়াচ্ছেন প্রিয় বয়স্য

বিদূষককে সঙ্গে নিয়ে। বসন্তলক্ষ্মীর সৌন্দর্যের তারিফ করে বিদূষক বললেন যে সুন্দরী রমণীদের প্রসাধন-কলাবসন্ত-লক্ষ্মীর প্রসাধন-নৈপুণ্যের কাছে হার মেনে যায়। নৃপতি অগ্নিমিত্র অবাক হয়ে বসন্ত-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য দেখছেন-

রক্তাশোকরুচ্য বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্।। ৩০।।

অর্থাৎ রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে ছাড়িয়ে গেছে, কুরুবকের শ্যামল এবং শ্বেত আভা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে , কাজল কালো ভ্রমরশ্রেণী শোভিত তিলক ফুলগুলি সুন্দরী রমণীদের মুখের তিলক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে। এইভাবে বসন্তের শোভা সুন্দরী রমণীদের প্রসাধনকলাকে হেলা ভরে হারিয়ে দিয়েছে। মালবিকা প্রমোদ-কাননে বসে আছেন , সেখানে চরণের ভূষণ নিয়ে প্রবেশ করলো সখি বকুলাবলিকা। মালবিকাকে নীরব দেখে বকুলাবলিকা বললো- কি ভাবছো সখি? এই রক্ত অশোকে ফুল ফোটা নিয়ে দেবী সত্যিই উৎসুক হয়ে আছেন । রাজা বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন–কি? অশোক তরুতে ফুল ফোটার জন্য এই আয়োজন? বকুলাবলিকা সখি মালবিকার কোনো আপত্তি ছাড়াই পাদুটিতে আলতা পরিয়ে নূপুর পরিয়ে দিলেন।

এই দেখে বিদূষক বললেন সত্যি পায়ের উপযুক্ত দায়িত্বই দেবী দিয়েছেন। রাজা তুমি ঠিকই বলেছ - এই বালিকা নখের দ্যুতি ছড়িয়ে কচি কিশলয়ের মত রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে - ইচ্ছাপূরণের জন্য কুসুমহীনা অশোকতরুকে অথবা চরণে প্রণত সদ্য অপরাধী দয়িতকে। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে বেদনা ক্লিষ্টা শয্যাশায়িনী দেবীর কাছে রাজা গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে হঠাৎ আর্তস্বরে চিৎকার-রত বিদূষকের প্রবেশ — রক্ষা কর প্রভু। দেবীকে শূন্য হাতে দর্শন করতে নেই , তাই ফুল তুলতে গিয়েছিলুম , সাপে দংশন করেছে - উপবনে অশোক ফুল তোলবার জন্য ডান হাতটি প্রসারিত করেছিলুম । অমনি কোটর থেকে সর্প-রূপী কাল আমাকে দংশন করলো। এই দেখ , দুটি হাতের চিহ্ন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' - এর পঞ্চম অঙ্ক শুরু হলো উদ্যানপালিকাকে নিয়ে। উদ্যানপালিকা - "দোহদের যেসব বিধান আছে সেই সব সংস্কার অনুযায়ী আমি রক্ত-অশোকের বেদী-রচনা করেছি। এখন দেবীকে খবর দিই গিয়ে। মালবিকার উপর দৈবের কি অনুগ্রহ! মালবিকার উপর দেবী এতো ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন , কিন্তু অশোক তরুর দোহদের সংবাদ পেলেই তিনি প্রসন্না হবেন। "উদ্যানপালিকা চলে যাবার প্রতিহারির প্রবেশ। প্রতিহারি বলছেন -"অশোক তরুর সৎকারে ব্যাপৃতা

দেবী আমাকে আদেশ করেছেন - আর্যপুত্রকে বলো গিয়ে যে আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে অশোক তরুর কুসুমশোভা দেখতে ইচ্ছা করি।"রাজার কাছে গিয়ে প্রতিহারি বললো-"জয় হোক মহারাজের । দেবী আপনাকে জানিয়েছেন যে তিনি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে রক্তাশোক তরুতে যে ফুল ফুটেছে তা দেখতে বাসনা করেন।" রাজা বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে ঘুরতে লাগলেন। বিদূষক বললেন- "অহো! গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমে অশোক তরুকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে । দেখুন মহারাজ।" রাজা বললেন - যথা সময়ে এই অশোক তরুতে ফুল না ফুটে ভালোই হয়েছে, নইলে এর অনন্য সাধারণ শোভা হতো কি করে দেখ – "মনে হচ্ছে এর দোহদ পুরণ করতে সক্ষম অশোকতরুর পুষ্পরাশি , যারা প্রথম বসন্তের সূচনা করেছিল , সব এসে একেই আশ্রয় করেছিল।" মহাকবি কালিদাস 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে ঊর্বশী-বিরহ-কাতরনৃপতি পুরূরবার বিরহাবস্থার রমণীয় চিত্র এঁকেছেন। সেখানে রক্তবরণ অশোক ফুলের মতো একটি রক্তিম মণির কথা উল্লেখ করেছেন। মনে হচ্ছে এই মণিটিকে ধরবার জন্য সূর্য তাঁর কিরণ-রূপ হস্ত প্রসারিত করেছেন। 'কুমারসম্ভবম্'-এর তৃতীয় সর্গে অশোকের উল্লেখ আছে। মদন, বসন্ত ও রতি যখন মহাদেব যে তপোবনে

ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে প্রবেশ করলেন তখন নিমেষে সেই তপোবনের চেহারা বদল হয়ে গেলো - "অশোকতরু স্বীয় স্কন্ধদেশ পর্যন্ত্য নবকিশলয় রাজিত কুসুমরাশি প্রসব করতে আরম্ভ করল। সেটি আর রমণীগণের সশব্দ নূপুর শোভিত চরণ স্পর্শের অপেক্ষা করল না।" উমা যখন মহাদেবের অর্চনা করবার জন্যে তাঁর তপোবনে যাবার সংকল্প করলেন তখন নানা ফুলের আভরণে নিজেকে সাজিয়েছিলেন। রক্তিম অশোকফুল উমার দেহে আভরণ হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি - "সেই গিরিজা পদ্মরাগিণীর স্থানে অশোক কুসুম , স্বর্ণালঙ্কারস্থলে কর্ণিকার পুষ্প এবং মুক্তমালার পরিবর্তে সিন্ধুবার পুষ্পমালা ধারণপূর্বক বসন্তকালীন কুসুমভূষণে সজ্জিত হয়ে এসেছিলেন।"

পরিশেষে বলা যায় যে , মহাকবি কালিদাস বার বার তাঁর কাব্য সমূহের মধ্যে এইভাবে অশোক পুষ্পকে নানান ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালিদাস তাঁর কাব্যে যে ভাবে অশোক পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

____()()____

কালিদাসের জীবন বৃত্তান্তের আলোচনা

-নমিতা জানা
সংস্কৃত অনার্স
চতুর্থ সেমিস্টার

গঙ্গা প্রবাহের মতোই ভারতীয় কাব্যমনীষী তত্ত্বদর্শী ও বিদ্বানেরা নিজ নিজ লেখনী ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা মানব জীবনের বাস্তবতাকে জীবন্ত ও রসসিক্ত করে তুলেছেন। এই সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন রহস্যকে উদ্ঘাটনকারিরা নিজেদেরকে রহস্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই বহিরাগত প্রমাণের ভিত্তিতে কালিদাসের জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী আছে।

প্রথম কিংবদন্তী - কালিদাস প্রথম জীবনে ছিলেন একজন মহামূর্খ। এতোটাই মূর্খ যে, যে ডালে তিনি বসে ছিলেন সেই ডালকে কাটছিলেন । অন্যদিকে তৎকালীন রাজা শারদানন্দের কন্যা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী বিদ্যোত্তমা ছিলেন শিল্প-নিপুণা, কলাবিদ্যায় পটীয়সী ও পণ্ডিত। ফলে তাকে বিবাহ করতে আসা অনেক সুপণ্ডিতগণ তার কাছে শাস্ত্র জ্ঞানে পরাজিত হন। যার ফলস্বরূপ বিদ্বানেরা ঠিক করেন এই বিদুষী কন্যার বিবাহ এক মূর্খের সাথে করাবেন। এমতাবস্থায় সন্ধানকার্য হেতু মহামূর্খ কালিদাসের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে পন্ডিতেরা কালিদাসকে বিদ্যোত্তমার সম্মুখে উপস্থিত করায়। উল্লেখ্য এখানে কালিদাসকে মৌন থাকার পরামর্শ দেন। পন্ডিতেরা মূর্খ কলিদাসকে তাদের গুরু ও সকল শাস্ত্রে পন্ডিত বলে পরিচয় দেন এবং তিনি মৌনব্রত পালন করছেন তাই সাংকেতিক শাস্ত্রালাপ করবেন। এই প্রস্থাবে রাজি হয়ে বিদ্যোত্তমা শাস্ত্রালাপ

শুরু করেন। প্রথমপ্রশ্ন, বিদ্যোত্তমা তাঁর একটি আঙুল দেখান যার অর্থ ঈশ্বর কি এক? মূর্খ কালিদাস বুঝলেন যে বিদুষী কন্যা তাঁর একটি চোখ উপড়ে দেওয়ার সংকেত দিচ্ছে। তাই সে দুটো আঙুল দেখিয়ে দুটো চোখ উপড়ে দেওয়ার সংকেত দিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে আপনার মতে ঈশ্বর এক কিন্তু গুরুদেবের মতে ঈশ্বর দুজন জীবাত্মা ও পরমাত্মা। দ্বিতীয় প্রশ্নে বিদ্যোত্তমা তার পাঁচটি আঙুল দেখিয়ে ছিল যার অর্থ ইন্দ্রিয় কি পাঁচটি? কালিদাস বুঝলেন যে বিদুষী কন্যা তাঁকে আঘাত করার সংকেত দিচ্ছে, তাই সে তাঁর পাঁচ আঙুল মুষ্টো করে ঘুঁষি মারার সংকেত দিলেন । এবার ও পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করল যে ইন্দ্রিয় পাঁচটি কিন্তু সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এইভাবে চতুরতার সঙ্গে সাংকেতিক ভাষাকে শাস্ত্র রূপে ব্যাখ্যা করে মূর্খ কালিদাসের সাথে বিদ্যোত্তমার বিবাহ করিয়ে দেন। কিন্তু সত্যতা প্রকাশ পায় যখন কালিদাস 'উট' কে দেখে 'উষ্ট উষ্ট ' বলে উঠেন। তখন বিদ্যোত্তমা কালিদাসের মুখে এমন কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে কালিদাস একজন মহামূর্খ ; তার সাথে ছলনা করে বিদ্যোত্তমার সাথে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। তাই দুঃখে তিনি কালিদাসকে কটাক্ষ করে থেকে নীচে ফেলে দেন । এই প্রসঙ্গে কথিত আছে যে কালিদাস মা কালীর উপর

পতিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বা কেটে মা কালীর চরণে অর্পিত হয়। এই কারণে ভগবতী দেবী প্রসন্ন হয়ে 'বরং ব্রূহি' বলে আর্শীবাদ করেন। এর ফলস্বরূপ মূর্খ কালিদাসের মুখ থেকে 'বিদ্যা' শব্দ বের হলে দেবী 'এবমস্তু' অর্থাৎ এটাই হোক বললেন। এর ফলে কালিদাস অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিদ্বান রূপে স্বীকৃতি পেয়ে যান। কবিত্ব শক্তি পাওয়ার পর তিনি বিদ্যোত্তমার কক্ষে উপস্থিত হয়ে বললেন -'অনাবৃত্তকপাটং দ্বারং দেহি' অর্থাৎ দরজার দ্বার খোল। তখন তাঁর স্ত্রী উত্তর দিল 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ' অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে কিছু বাগ্বৈদগ্ধ্য এসেছে। কথিত আছে যে কালিদাসের স্ত্রীর এই তিন শব্দ নিয়ে তিনটি মহান কাব্য কবি রচনা করেছেন। 'অস্তি'পদের দ্বারা 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা ' এই বাক্যকে সামনে রেখে 'কুমারসম্ভবম্'রচনা করেন। দ্বিতীয় শব্দ 'কশ্চিৎ'শব্দটি নিয়ে 'কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা' বাক্যটিকে সামনে রেখে 'মেঘদূতম্' এই খন্ড কাব্য রচনা করেন। আর তৃতীয় শব্দ 'বাক্' এই নিয়ে 'বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ' বাক্যটিকে প্রথমে রেখে 'রঘুবংশম্' মহাকাব্য রচনা করেন। কিন্তু অনেক পন্ডিত এই কাহিনীকে নিরর্থক বলে মনে করেন। যে সমস্ত পন্ডিত বিদুষী কন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি , পরে সেই মূর্খকে আশ্রয় করে করে কিভাবে শাস্ত্রার্থ করেছে ?

এখানে এটাই বড়ো প্রশ্নের সম্মুখে পড়তে হয়। এরপর সেই বিদুষীই বা কীভাবে না জেনে এত বড় নির্ণয় নিয়ে নিয়েছিল? এই সংশয়ের সমাধান স্বরূপ তার প্রত্যুত্তরে হল 'অস্তি কশ্চিত্ বাগবিশেষঃ', এর থেকে চতুর্থ রচনা হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' যা সংস্কৃত বাঙ্ময়ে শ্রেষ্ঠকৃতি রূপে বলা যায়। উপযুক্ত ঘটনাবলী কালিদাসের জীবনে ঘটা বা না ঘটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী – আবার অন্য একটি কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে কালিদাস লঙ্কা রাজা কুমারদাসের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে , কুমারদাস এক পতিতাকে একটি সমস্যাপূর্তি (ধাঁধা) বলেন, তার উত্তর দিতে পারলে রাজা প্রচুর ধনরাশি দান করবেন বলে ঘোষণা করেন। সেই সমস্যাপূর্তি (ধাঁধাটি) হল - ''কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে '' অর্থাৎ পদ্মফুল পদ্মেই উৎপন্ন হয় যা শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না । সেই পতিতা নায়িকা রসমর্মজ্ঞ প্রশ্ন মহাকবি কালিদাসের সম্মুখে উত্থাপন করলে , কালিদাস সহজেই এর উত্তরে বলেন ''বালে তবমুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্'' অর্থাৎ হে বালিকা তোমার মুখপদ্মে কেন দুটি (লোচন) পদ্ম? রসমর্মজ্ঞ প্রশ্নের সমাধান ফলে পতিতা নায়িকা ধনরাশি লোভে কালিদাসকে হত্যা করে । এই কথা শুনে কুমারদাসও দুঃখে সেই চিতাতে ঝাঁপিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল।

তৃতীয় কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি তাঁর

সভার নবরত্নের মধ্যে একজন রত্ন ছিলেন।
চতুর্থ কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে কালিদাস রাজা ভোজের আশ্রিত কবি ছিলেন। বাস্তবে ধারার রাজা ভোজের কবি ছিলেন পরিমল বা পদ্মগুপ্ত। সেই পরিমলের সুন্দর কাব্য শৈলী কবি কালিদাসের লেখনীশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষ্য করা যায় । তাই তাকে কালিদাস উপাধি বা পরিমল কালিদাস উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল । কিন্তু ভুলবশত পরিমলকে কালিদাস হিসেবে মনে করা হয়।
এই সমস্ত কিংবদন্তী কাহিনীগুলি প্রমাণ তথা সাক্ষীর অভাবে সেগুলো বিভিন্ন জনের কাছে কল্পিত কথা বিষয় বস্তু মনে হতে পারে। কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত কাহিনী গুলো বর্ণিত হয়েছে। তাই কবি কালিদাস কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। সমস্ত ঘটনা অনুমানের উপর আধারিত হয়ে রয়েছে। তবে কালিদাসের নৈসর্গিক, সর্বতোমুখী প্রতিভা, বিলক্ষণ কল্পনাশক্তি এবং উৎকৃষ্ট নির্মাণ কৌশল কাব্য জগতে অনুপম ও অদ্বিতীয়।

--------******--------